বিশ্বের সেরা কল্পবিজ্ঞান

অমিত চক্রবর্তী

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

সূচি

গল্প	গল্পকার	পৃষ্ঠাঙ্ক
চুরি যাওয়া জীবাণু	এইচ জি ওয়েলস	৯
অদেখা আলো	আলেকজান্দর বেলিয়ায়েভ	১৪
মৃত্যুঘর	হারমান ম্যাক্সিমভ	২২
সেই নীল বোতলটা	রে ব্রাডবারি	৩১
গাধা	আইজ্যাক অ্যাসিমভ	৩৬
বাবার স্ট্যাচু	আইজ্যাক অ্যাসিমভ	৪০
ক্রীতদাস	গ্লেব অ্যানফিলভ	৪৬
সবুজ মানুষ	ক্লিফোর্ড সিম্যাক	৫১
অভিযাত্রী	ভ্যালেন্টিনা ঝুরাভলেভা	৬০
বড়দিনের তারা	আর্থার সি ক্লার্ক	৬৯
ঈশ্বরের নাম	আর্থার সি ক্লার্ক	৭৫
জঞ্জাল	ভ্লাদিমির গ্রিগরিয়েভ	৮২
মতামত	ফ্রেডারিক পল ও সি এম কর্নব্লাথ	৯১
শুধু একজন	ইগর রসোখোভাৎস্কি	৯৯
পরীক্ষার দিন	হেনরি স্লেসার	১০৪
আজব ডিম	বিল ব্রাউন	১০৯
গুটি	ডিন কুনজ	১১৭
ছদ্মবেশ	আব্রাম ডেভিডসন	১২২
ছোট্ট মেয়ে অ্যান	উর্মুলা কে লেগুইন	১২৮
খুদে উদ্যোগ	উইলিয়াম লি	১৩৫

চুরি যাওয়া জীবাণু

এইচ জি ওয়েলস

কাচের স্লাইডটাকে মাইক্রোস্কোপের নিচে রেখে প্রফেসর বললেন, 'কলেরার মতো ভয়াবহ জীবাণু যদি দেখতে চাও তো, এখানে এসো।'

যার উদ্দেশ্যে বলা, সেই ফ্যাকাসে চেহারার যুবকটি বেশ নার্ভাস বোধ করছিল। ওকে দেখেই বোঝা যায়, জন্মে কখনোও কোনো ল্যাবরেটরিতে ঢোকেনি এবং মাইক্রোস্কোপ দেখেনি। প্রফেসরের বেশ মজাই লাগছিল। সাধারণত ওঁর মতো নামজাদা জীবাণু-বিশেষজ্ঞের কাছে এ জাতীয় ছেলেরা আসে না।

'কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না।' মাইক্রোস্কোপ থেকে চোখটা সরিয়ে নিয়ে ছেলেটি বলল—

'নিশ্চয়ই ফোকাস থেকে সরে গেছে; ওই স্ক্রুটা সামান্য ঘোরাও। এবারে দেখতে পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, পেয়েছি।' ছেলেটি সায় দেওয়ার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে। 'কতগুলো গোলাপী রঙের সুতোর মতন দেখাচ্ছে; আপনি বলছেন, ওগুলোই কলেরার জীবাণু? নিজেদের সংখ্যা অস্বাভাবিক বাড়িয়ে তুলে এগুলোই একটা গোটা শহরকে উজাড় করে দিতে পারে? আশ্চর্য!'

কাচের স্লাইডটা হাতে ধরে মাইক্রোস্কোপের কাছ থেকে সরে আসে ছেলেটি। প্রফেসরের দিকে ওটা এগিয়ে দিয়ে বলে, 'বিশ্বাস হয় না—এই খুদে জীবগুলো এতটা ভয়ঙ্কর! আচ্ছা, এগুলো কি জীবিত?'

'উঁহু, ওগুলোকে মেরে ফেলা হয়েছে। আমার তো ইচ্ছে করে, এগুলোর মতোই দুনিয়ার যাবতীয় রোগ জীবাণুকে মেরে ফেলি।'

'আপনারা কি শুধু মৃত জীবাণু নিয়েই গবেষণা করেন?'

'তা কেন? জীবিত ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস নিয়েও কাজ করতে হয়।' বলেই প্রফেসর ঘরের একপাশে রাখা কাচের আলমারির দিকে এগিয়ে যান। তারপর একটা মুখ আঁটা কাচের ছোট শিশি হাতে নিয়ে বলেন, 'এই যে এর মধ্যে জলের মতো জিনিসটা দেখছ—এর ভেতরে জীবিত রোগজীবাণু কিলবিল করছে। খালি চোখে অবশ্য কিছু বুঝবে না।'

'এগুলোও কি কলেরার জীবাণু?'

ছেলেটির রক্তশূন্য মুখের দিকে তাকান প্রফেসর। খানিক আগেই ওঁর এক বন্ধুর চিঠি নিয়ে যখন দেখা করল, প্রথমটায় বিরক্তই হয়েছিলেন। ছুটির দিনে লাঞ্চের পর বাড়ির ল্যাবরেটরি-ঘরের এক কোণে আরাম কেদারায় শুয়ে বই পড়তে ভালোবাসেন। সেইসময় হঠাৎ করে অপরিচিত কারোর এসে পড়াটা পছন্দ না করারই কথা। পরে যখন শুনলেন, ছেলেটি ওঁর গবেষণার বিষয়টা নিয়ে কাগজে লিখতে চায় তখন স্বাভাবিকভাবেই বিরক্তিটা চলে গেছে। তাছাড়া, ছেলেটি বিজ্ঞানের ব্যাপার-স্যাপার না বুঝলেও, জানার আগ্রহ আছে। ওর দৃষ্টিতে ভয়, বিস্ময় আর কৌতূহল মিলেমিশে ছিল। তা দেখে, বেশ মজাই লাগছিল প্রফেসরের।

'হ্যাঁ। সত্যি বললে, মহামারি রোগকে বোতলবন্দি করে রাখা আছে এখানে। যদি এইরকম একটা শিশিকে ভেঙে ফেলে দাও পানীয় জলের রিজার্ভারে, তবে আর দেখতে হবে না! মৃত্যুর ছায়া নেমে আসবে গোটা শহরের ওপর। এই অসুখ স্ত্রীর কাছ থেকে স্বামীকে কেড়ে নেবে, শিশুকে ছিনিয়ে নেবে মায়ের কোল থেকে! শুধু পানীয় জলই বলি কেন, মাটিতে পড়লেও এইসব মৃত্যুদূতের হাত থেকে রেহাই নেই। মাটির নিচে সঞ্চিত জলে গিয়ে একবার মিশলেই হল— যেখানে যত কুয়ো আছে, সেগুলোর জলকে সংক্রামিত করবে! তখন কি আর মহামারীকে আটকানো সম্ভব?'

ছেলেটি নিবিষ্টমনে প্রফেসরের কথাগুলো যেন গোগ্রাসে গিলছিল। উনি থামতেই হঠাৎ বিড়বিড় করে বলে উঠল, 'সত্যি কী বোকা আমরা! এ জিনিস থাকতে বোমা বানানোর দরকার কী?'

ভেতরের দরজায় আঙুলের টোকার শব্দ কানে এল প্রফেসরের। নিশ্চয়ই স্ত্রী কিছু বলবে। 'এক মিনিট, আসছি'—বলেই ছেলেটিকে বসিয়ে রেখে বাড়ির ভেতরে গেলেন।

ল্যাবরেটরি-ঘরে ফিরে আসতে কয়েক মিনিট সময় লাগল। প্রফেসর দেখলেন, ছেলেটি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। উনি ঘরে ঢুকতেই বলল, 'আজ আপনার প্রায় এক ঘণ্টা সময় নিয়ে নিয়েছি। এখন চারটে বাজতে বারো মিনিট বাকি; আমার সাড়ে তিনটেয় ওঠা উচিত ছিল। ঠিক চারটের সময় একজনের সঙ্গে দেখা করার কথা।'

মাথা ঝুঁকিয়ে প্রফেসরকে ধন্যবাদ জানাতে জানাতে বাইরের দরজার দিকে এগোল ছেলেটি। প্রফেসরও সঙ্গে এলেন। ছেলেটি বেরিয়ে যেতেই সদর দরজা বন্ধ করে ল্যাবরেটরি-ঘরে ফিরে এলেন। রিপোর্টার ছোকরার হঠাৎ এমন হন্তদন্ত

হয়ে বেরিয়ে যাওয়াটা মোটেই যেন স্বাভাবিক লাগছিল না। ছেলেটা সত্যি সত্যিই সাংবাদিক, নাকি অন্য কোনোও মতলবে এসেছিল—সেটাই ভাবতে ভাবতে ল্যাবরেটরি-ঘরের টেবিলের দিকে এগোতে গিয়েই চমকে উঠলেন প্রফেসর। কাচের শিশি উধাও। অথচ ঠিক মনে আছে, ভেতরের ঘরে যাওয়ার আগে শিশিটা ওই টেবিলের ওপরেই রেখেছিলেন।

'মিনি, এক্ষুনি একবার এসো।' স্ত্রীকে চিৎকার করে ডাকলেন।

'কী ব্যাপার?' পাশের ঘর থেকে স্ত্রীর গলা শোনা গেল।

'একটু আগে যখন ঘরের ভেতরে তোমার সঙ্গে কথা বলছিলাম, তখন কি আমার হাতে কোনো শিশি ধরা ছিল।'

''না তো।'

'সর্বনাশ হয়েছে!' বলেই সদর দরজার দিকে ছোটেন প্রফেসর।

স্ত্রী ঘরে ঢোকার আগেই পাজামা আর রবারের চটি পরা অবস্থাতেই রাস্তায় নেমে পড়েন। বাড়ির সামনেই ঘোড়ার গাড়ির কোচোয়ানদের জটলা। একটু আগেই রোগা ফ্যাকাসে কোনো ছোকরাকে বাড়ি থেকে হন্তদন্ত হয়ে বেরোতে দেখেছে কিনা জিজ্ঞাসা করতেই একজন আঙুল দিয়ে খানিক দূরের একট গাড়ি দেখিয়ে দেয়। দূর থেকেও গাড়ির ভেতরে বসে থাকা ছেলেটিকে চিনতে ভুল হয় না প্রফেসরের। সঙ্গে সঙ্গে তিনিও উঠে পড়েন সামনের একটা ফাঁকা গাড়িতে। কোচোয়ানকে বলেন, 'যেভাবেই হোক, সামনের ওই গাড়িটাকে ধরা চাই।'

খোলা দরজার কাছে এসে প্রফেসরকে ঘোড়ার গাড়িতে উঠতে দেখেন প্রফেসর-গিন্নি। স্বামী একজন বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞানী মাত্রেই একটু খ্যাপাটে গোছের হয়ে থাকে—কিন্তু তাই বলে লন্ডন শহরে এই শেষ-বিকেলের ঠান্ডায় কোনো সম্ভ্রান্ত লোক খালি পায়ে এবং ঘরের পোশাকে রাস্তায় ঘুরবে—এটা মেনে নেওয়া কষ্টকর। তাছাড়া ঠান্ডা লাগার আশঙ্কাও কিছু কম নয়। সুতরাং মিনিট দুয়েকের মধ্যে স্বামীর ওভারকোটটা হাতে নিয়ে তিনিও বেরিয়ে আসেন রাস্তায় এবং সামনে যে গাড়িটা পান তাতে উঠে পড়ে প্রফেসরের গাড়িকে অনুসরণ করার নির্দেশ দেন।

শহরের রাস্তায় এমন দৃশ্য সচরাচর দেখা যায় না। ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছে তিন-তিনটে ঘোড়ার গাড়ি। কে আগে পৌঁছোবে তার যেন প্রতিযোগিতা চলছে। রাস্তার দুপাশে ভিড় জমতে দেরি হয় না। হাততালি দিয়ে, আওয়াজ করে তারা উৎসাহ দিতে থাকে কোচোয়ানদের।

প্রথম গাড়িতে বসে থাকা ছেলেটির চোখে মুখে উল্লাস আর ভয় মিলেমিশে

রয়েছে। হাতের মুঠিতে ধরা শিশিটায় রয়েছে মারাত্মক অস্ত্র যা দিয়ে অনায়াসে ধ্বংস করা যায় গোটা শহরটাকে। এত সহজে যে ব্যাপারটা ঘটবে তা নিজেও কখনোও ভাবেনি। এর জন্য অবশ্য ওকে পাকা অভিনেতার মতো কথাবার্তা চালাতে হয়েছে; ভান করতে হয়েছে, যেন সত্যিসত্যিই জীবাণু সম্পর্কে কতই না আগ্রহ ওর! প্রফেসর লোকটি ব্যাকটেরিয়া-জীবাণু নিয়ে গবেষণা করেন সেটা জানা ছিল, কিন্তু তাই বলে কলেরার মতো ভয়ঙ্কর রোগের জীবাণু এমনভাবে হাতের মুঠোয় চলে আসবে তা একেবারে অকল্পনীয়। অ্যাদ্দিনে ওর সুযোগ এসেছে সারা দুনিয়াকে ওর ক্ষমতা দেখানোর। এতদিন ধরে যারা ওকে নিষ্কর্মা বলে অবজ্ঞা করেছে, খ্যাপাটে-পাগল বলে ঠাট্টা করেছে, ওকে মানুষ বলেই মনে করেনি—তাদের সবাইকে ও চরম শিক্ষা দিয়ে যাবে। এখন শুধু একটাই কাজ বাকি। লন্ডনের যে বড় জলাধার থেকে পাইপে করে জল পাঠানো হয় শহরের সমস্ত বাড়িতে, মুখটা খুলে নিয়ে তার মধ্যে শিশিটাকে ফেলে দেওয়া। তাহলেই ওর এতদিনের পরিকল্পনা সার্থক হবে।

পেছনে যে আর একটা গাড়ি তাকে ধরার জন্য ছুটে আসছে, কোচোয়ানেরই তা প্রথম নজরে এল। তার কথায় পেছনে ঘাড় ঘুরিয়ে প্রফেসরকে দেখতে পেল ছেলেটি। 'বুড়োটা আবার পিছু নিয়েছে দেখছি'—বলেই পকেট থেকে একটা কড়কড়ে নোট বের করে কোচোয়ানের দিকে এগিয়ে দিতেই কাজ হল। প্রচণ্ড জোরে চাবুক হাঁকড়াতেই ঘোড়াটার ছোটার গতি একটু বাড়ল। প্রফেসরের গাড়ি ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে দেখে ছেলেটি যখন স্বস্তি পেতে শুরু করেছে তখনই ঘটল বিপত্তি। রাস্তার গর্তে হঠাৎ বেকায়দায় পড়তেই গাড়িটা ঝনাৎ করে কেঁপে উঠল। আর অমনি হাতে ধরা শিশিটা ছিটকে গিয়ে গাড়ির মেঝেয় পড়ে ভেঙে গেল। কাচের শিশি থেকে বেরিয়ে আসা তরল জিনিসটা শুষে নিতে শুকনো কাঠের সময় লাগল না। মুহূর্তের বিহ্বলতা কাটিয়ে ভাঙা শিশিটাকে হাতে তুলে নিতে, তার ভেতরে অবশিষ্ট কয়েক ফোঁটা তরল নজরে এল ছেলেটির।

প্রচণ্ড ঝাঁকুনির সঙ্গে সঙ্গেই ঘোড়ার রাশ টেনে ধরেছিল কোচোয়ান। প্রফেসরের গাড়িটা যখন পাশে এসে দাঁড়াল তখনও হতভম্বের মতন হাতে ধরা ভাঙা শিশির দিকে তাকিয়ে বসেছিল ছেলেটি। প্রফেসরের চিৎকারে সম্বিত ফিরল। এক মুহূর্ত দেরি না করে কাচের শিশির অবশিষ্ট দু-তিন ফোঁটা তরল নিজের গলার মধ্যে ঢেলে দিল ছেলেটি। তারপর হাত নেড়ে নাটকীয় কায়দায় বলল, 'দেরি করে ফেলেছেন স্যার। আপনার ওই মারাত্মক জীবাণু এখন আমার শরীরের মধ্যে চলে গেছে। আমার থেকে এটা যাবে আরও হাজার হাজার লোকের মধ্যে। আমি তো মরবই, কিন্তু আপনারাও কেউ নিস্তার পাবেন না।'

উন্মাদের দৃষ্টি চিনতে ভুল হল না প্রফেসরের। কী মনে করে গাড়ি থেকে নামতে গিয়েও আর নামলেন না। ততক্ষণে প্রফেসর-গিন্নিও এসে পড়েছেন। তাঁকে ইশারায় ডেকে নিজের গাড়িতে তুলে নিলেন প্রফেসর। ওভারকোটটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে কোচোয়ানকে বাড়ি ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। ততক্ষণে ছেলেটি রাস্তা দিয়ে হাঁটতে শুরু করেছে। প্রফেসর দেখলেন, ইচ্ছে করেই পথচারীদের গা-ঘেঁষে এগিয়ে চলেছে ছোকরা। স্ত্রীকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, 'আশ্চর্য, ছেলেটা যে বদ্ধ উন্মাদ—তখন একেবারেই বুঝতে পারিনি!'

বাড়ি ফিরতে ফিরতে সমস্ত ঘটনাটা স্ত্রীকে শোনানোর পর মুচকি হেসে বললেন, 'ছেলেটি যখন জানতে চাইল, শিশির মধ্যে কলেরার জ্যান্ত জীবাণু রয়েছে কিনা, ওকে ভয় পাওয়াতেই বলে দিলাম —'হ্যাঁ'। ছেলেটি যে ওটা নিয়ে পালাবে তা ঘুণাক্ষরে মাথায় আসেনি।'

'কী ছিল ওতে?'

'নতুন এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া নিয়ে কালচার করছিলাম কদিন ধরে। তারই একটা নমুনা ছিল ওতে।'

'কোন অসুখের জীবাণু ওটা?'

তা ঠিক এখনও জানি না। তবে কয়েকটা গিনিপিগ আর একটা বেড়ালছানার গায়ে ওটা ঢোকাতেই ওদের গায়ে নীল রঙের ছোপ ধরে গিয়েছিল, সেটা দেখেছি। ব্যাকটেরিয়াগুলো পেটে যাওয়ার পর ওই ছোকরার গায়ের রঙটা কেমন দাঁড়ায়, সেটা দেখার কৌতূহল হচ্ছে, বুঝলে?—বলেই জোরে জোরে হেসে ওঠেন প্রফেসর।